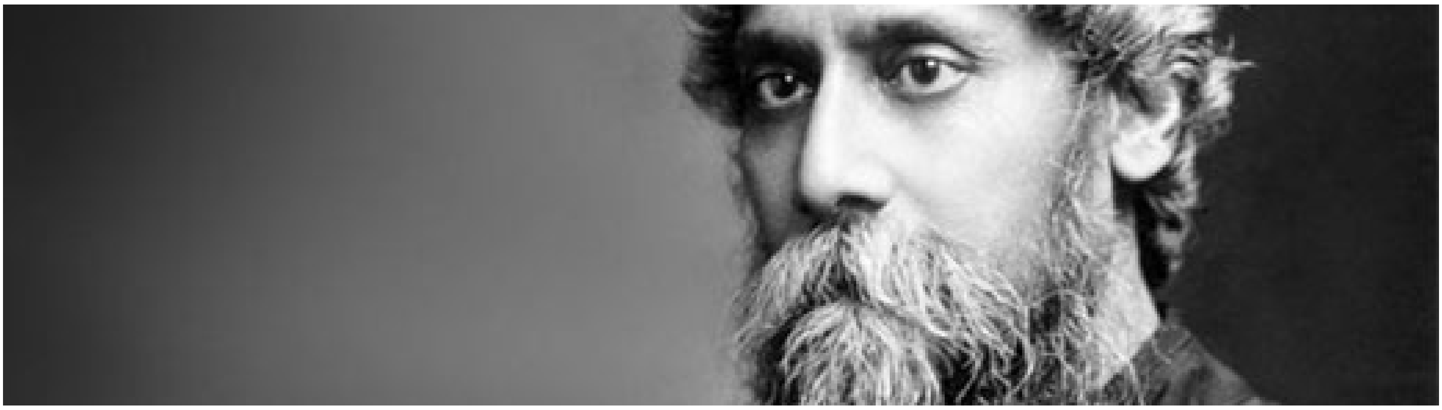

লালন ফকির, রবীন্দ্রনাথ ও ইসলাম

ফাহমিদ-উর-রহমান

লালন ফকিরের আজ যে দেশজোড়া খ্যাতি তার পিছনে আছে কবি রবীন্দ্রনাথের একটা বড় ভূমিকা। কবি তার অক্সফোর্ডে দেয়া বক্তৃতায় লালনের “খাঁচার ভিতর অচিন পাখি” গানের ইংরেজি তরজমা করে তার বিদেশী শ্রোতাদের শুনিয়েছিলেন। কবির সেই বক্তৃতা পরে “মানুষের ধর্ম” হিসেবে প্রকাশিত হয়। সেই বক্তৃতায় কবি লালনকে উপনিষদের ঋষিদের সাথে তুলনা করেছিলেন। রবীন্দ্রের এই ভূমিকার ফলেই লালন সম্বন্ধে শিক্ষিত শ্রেণির কৌতুহল বেড়ে যায়। কোনো সন্দেহ নেই এর ফলে লালন এক নিরক্ষর পল্লী এলাকার ফকির থেকে রাতারাতি উন্নতমানের সাধক, গায়ক ও কবি হিসেবে মর্যাদা লাভ করেন।

শুধু তাই নয় - রবীন্দ্রনাথ লালনের “খাঁচার ভিতর অচিন পাখি” গানটি আর বিখ্যাত গোরা উপন্যাসেও উদ্ধৃত করেছেন। এর আগে তিনি লালনের অজস্র গানের ভিতর থেকে ২০টি গান বেছে “প্রবাসীতে” প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন যা সুধী মহলের কাছে প্রশংসা কুড়িয়েছিল। কবির এসব কাজকর্ম প্রকারান্তরে লালনকে বিখ্যাত করে দিয়েছে। লালন ফকিরকে নিয়ে কবির এই উৎসাহ দেখে মনে হয় তিনি হয়তো কিছুটা তার গান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কুষ্টিয়া অঞ্চলে লালন ফকিরের শিষ্যদের মধ্যে এখনও অনেকের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে লালনের গানের খাতাই গীতাঞ্জলিতে রূপান্তরিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজোড়া খ্যাতি তথা নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মূলে আছেন বাংলার লালন ফকির। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আরো একটা গল্প জারি আছে ফকিরদের মধ্যে। কবি নাকি লালন ফকিরকে শিলাইদহের কুঠিতে ডেকে নিয়ে তাঁর স্বকণ্ঠে গান শুনেছিলেন। এসব ঘটনার সত্যাসত্য নির্ধারণ করার দায়িত্ব বর্তেছে আজ গবেষকদের উপর। তবে লালন ফকিরের আখড়া ছেউড়িয়া আর রবীন্দ্রের কুঠি শিলাইদহ কুষ্টিয়ার কুমারখালি থানায় খুবই স্বল্প দূরত্বের মধ্য। শুধু মাঝখানে গড়াই নদী দুটি স্থানকে পৃথক করে রেখেছে। তাছাড়া লালনের ছেউড়িয়া ছিল রবীন্দ্রের জমিদারীর মধ্যে। সেই হিসেবে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ কোনো অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। কিন্তু কথা হচ্ছে রবীন্দ্রের উপর লালনের প্রভাব কতটুকু। লালন ও তার শিষ্য বাউলরা দেহতত্ত্বে বিশ্বাসী। যে অর্থে আমরা মিস্টিক শব্দটা ব্যবহার করে থাকি বাউলদের গান সেরকম নয়। সে গানকে বলা যায় বড়জোর এসোটেরিক (Esoteric)। তার মর্ম ভেদ করা সকল শ্রোতার পক্ষ সম্ভব নয়। এটা পারে দীক্ষিত শিষ্যরা। বাউলদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক আছে। কিন্তু এরা কোনো জনপ্রিয় শাস্ত্রীয় ধর্ম মানে না। বাউলরা বেদ-কোরআন মানে না, মন্দির-মসজিদে যায় না, পূজা-রোজা নামাজ করে না, দেবদেবী-অবতার পয়গম্বর মানে না, এমনকি ইশ্বর-আল্লাহকেও ডাকে না। এরা কোনো ধর্মানুসারী নয়। এদেরকেই ইংরেজিতে বলে Non-conformist। আলেম-ওলামারা এজন্যই এদেরকে বলেছেন বে-শরা ফকির। এদের জীবনযাত্রা সামাজিক মুসলমান বা হিন্দুর মতো নয়। এই কারণে হিন্দু-মুসলমান কোনো ধর্মই এদেরকে গ্রহণ করেনি।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রহ্মনিষ্ঠ, চেতনার দিক দিয়ে উপনিষদীয়। তাই তিনি বাউলদের মতো দেহতত্ত্ববাদী হননি। বাউল সাধনার প্র্যাকটিস ছাড়া শুধুমাত্র তত্ত্ব দিয়ে কেউ বাউল হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এরকম কোনো বাউল সাধনার প্র্যাকটিস করেননি কিংবা দেহতত্ত্বের পক্ষে তার কোনো লেখালেখিও নেই। সম্ভবত কবি লালনের কিছু কিছু গানের বাণী ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। হয়তো সেটাই তার লালন-আকর্ষণের কারণ। কোনো সন্দেহ নেই লালনের কিছু কিছু গান প্রাণস্পর্শী, মনকাড়া- যে কাউকেই টানে। কিন্তু একজন ব্যক্তির স্বল্প কয়েকটি মানোত্তীর্ণ গান দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের বিচার চলে না। তার সমগ্র জীবনের কর্মকান্ড দিয়েই এর বিচার করতে হয়।

লালন দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন - ১১৬ বছর। এই বিপুল জীবনে তিনি অজস্র গান রচনা করেছেন। সবই মুখে মুখে। তার

জীবদ্দশায় শিষ্যও ছিল পাঁচ থেকে দশ হাজার। এদের তিনি কি উপদেশ দিতেন তা আর জানা যায় না। লালনের গান অজস্র হলেও সবই শ্রবণ সুখকর নয় - সব গানই কিন্তু আমাদের কানের ভিতরে যেয়ে মরমে পশে না। অধিকাংশ গানই ক্লান্তিকর। হয়তো কয়েক পঙক্তি মুগ্ধ করার মতো। তাছাড়া পুনরাবৃত্তিও প্রচুর। এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ শুধু বিশটি গান পছন্দ করেছিলেন। লালন হিন্দু না মুসলমান এ নিয়েও নানা মুনির নানা মত। কারো মতে তিনি হিন্দুর ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলমান ফকিরের কাছে দীক্ষা নেন। কারো মতে জন্মসূত্রেই মুসলমান। কিন্তু লালন মনে হয় এসব সংশয় তার জীবদ্দশায় ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। আসলে ব্যক্তিজীবনে তার নিজস্ব বাউল মত ছাড়া আর কোনো ধর্মের তিনি অনুসরণ করেননি।

তার বিখ্যাত গানেই তিনি বলেছেনঃ

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে, লালন ভাবে জাতের কী রূপ দেখলাম না এই নজরে।

এই কারণেই তার শেষকৃত্য কোনো ধর্মমতে হয়নি। তার শিষ্যরা তার মৃতদেহ মাটিচাপা দিয়ে রেখেছিলেন মাত্র।

লালনের গানে যে আকর্ষণ থাকুক না কেন তার সাধনার ক্ষেত্র হচ্ছে দেহতত্ত্ব। একটি চিন্তার গুরুত্ব বোঝা যায় তার প্রায়োগিক ফলাফলের উপর। লালনের দেহতত্ত্ব সেই অর্থে বিপজ্জনক ও ভয়ংকর। লালনের সাধনা দেহবর্জিতও নয়। এই সাধনা নারীবর্জিতও নয় অথচ সন্তানবর্জিত যা নিয়ে সামাজিক মানুষের সন্দেহ ও অশ্রদ্ধা স্বাভাবিক। বাউলরা সমাজে থাকে না, গৃহীত হয় না। এদের সম্পত্তি থাকে না। দিনভর গান গেয়ে বেড়ায়। রাত্রে আখড়ায় মিলিত হয়। এরা ভিক্ষাজীবী। এই সাধনায় নারী হচ্ছে অপরিহার্য সঙ্গিণী। এদের সাথে মিল আছে বৌদ্ধ সহজিয়া ও হিন্দু বৈষ্ণব সাধনার। কিন্তু মিল নেই মুসলিম সুফিদের। সুফিদের সাধনা নারীবর্জিত। ভগবত প্রেমই হলো সুফিদের আসল কথা।

লালনের গানে আছে এই মানুষে দেখ সেই মানুষ আছে। লালনের ভাষায় সেই মানুষ হচ্ছে আলেক মানুষ বা অলখ মানুষ। এই অলখ মানুষ ঠিক আল্লাহ, ঈশ্বর বা গড নন। সেদিক দিয়ে লালন ও তার বাউল সম্প্রদায় হিউম্যানিস্ট - মানবিকবাদী। এই পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু বাউলরা এই মানবিকবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়েছেন এক কুশ্রী কাম সাধনার পথ, যাকে এক ধরনের ব্যাভিচারের সংস্কৃতি বলা যেতে পারে।

লালনের একটা গানে আছেঃ

করি কেমনে শুদ্ধ প্রেম রসের সাধন প্রেম সাধিতে কেঁপে ওঠে কাম নদীর তুফান বলবো কী হইলো প্রেমের কথা কাম হইলো প্রেমের লতা কাম ছাড়া প্রেম যথা, তথা নাইরে আগমন।

> এই মানুষে সেই মানুষকে দেখার কথা বলে বাউলরা দেহের ভিতর দেহাতীতের সন্ধান করেন নরনারীর যুগল সাধনার মাধ্যমে। দেহের সাথে দেহের মিলন না হলে মাধুর্য ভজন হয় না। মাধুর্য ভজন না হলে মানুষ হয়ে জন্মানোর স্বার্থকতা কোথায়? এই হলো বাউলদের মৌল জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসার উত্তর তারা খোঁজেন বিকৃতরুচি কাম সাধনায়। এই কারণে বাউলরা জোড়ে জোড়ে থাকেন। বাউল সাধনা একাকী পুরুষের বা একাকী নারীর সাধনা নয়। একে এক ধরনের পাশ্চাত্যের লিভিং টুগেদারের সাথেও তুলনা করা চলে। লালনের ধর্মমতের চারিচন্দ্রভেদ, ষড়চক্র, দ্বিদলপদ্ম, মূলধারাচক্র, সহস্রদলপদ্ম, অধর মানুষ, ত্রিবেণী, সাধনসঙ্গিণী, প্রেমভজা প্রভৃতি কাম আরাধনার ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দের তাৎপর্য জানলে বা শুনলে যে কোনো মানুষের লালনের প্রতি শ্রদ্ধা কমে যাবে।

বাউলদের এই ব্যাভিচারী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কুষ্টিয়ায় কয়েকবার বাউল-খেদাও আন্দোলন হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৪২ সালের বাউল-খেদাও আন্দোলন খুবই বিখ্যাত। লালনের বাউল সাধনা সেদিন হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেরই নিন্দা কুড়িয়েছে।

লালন যতো না ফকির তার চেয়ে বেশি বাউল। কারণ ফকির, দরবেশ, আউলিয়া, সুফি শব্দগুলো হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতিজাত। মুসলিম মিস্টিকদের বুঝাতে এসব শব্দ ব্যবহার করা হয়। বাউলরা সেরকম কোনো সুফি ধারার অনুসারী নয়। সুফিবাদের প্রথম কথা হচ্ছে নিজের কামনার বিরুদ্ধে লড়াই করে পরিশুদ্ধ হওয়া, সদভ্যাস গড়ে তোলা এবং আল্লাহর প্রেমে এমনভাবে নিমজ্জিত হওয়া যাতে দুনিয়ার কোনো কিছুই তাকে আকর্ষণ না করে। সুফি পরিভাষায় একে বলে ফানা। আজকে জেহাদ শব্দটা নিয়ে পশ্চিমা

মিডিয়া এমনভাবে হৈচৈ শুরু করেছে যাতে এর মৌলবাণী হারিয়ে যেতে বসেছে। এ শব্দটাকে এখন খুনোখুনি, সন্ত্রাসের সমার্থক বানিয়ে ফেলা হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন নিজের কামনার বিরুদ্ধে লড়াই করা হচ্ছে সর্বোত্তম জেহাদ। ইসলামী পরিভাষায় একে বলে জেহাদে আকবর। সুফিরা জেহাদের এই তাৎপর্যকে গ্রহণ করে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান। সুফিদের পরিভাষায় একে বলে সুলহিকুল- সকলের জন্য শান্তি।

সুফিদের যে সাধন পদ্ধতি সেটা এতো সহজ নয়। সংযম, কৃচ্ছসাধন ও পরিশুদ্ধ জীবন-যাপন এগুলো হচ্ছে সুফি জীবনধারার অপরিহার্য অংশ। সক্রেটিস একবার বলেছিলেন Having the fewest wants, I am nearest to the gods। এ অনেক পুরনো চিন্তা। পার্থিব আকর্ষণকে যে জয় করতে পারে না, সে কখনো সুফি হতে পারবে না।

সুফি সাধনমার্গের তিনটি স্তর আছে - শরিয়ত, তরিকত ও হাকিকত। সুফিদের রাস্তায় হাঁটতে হলে প্রথমেই ইসলামী শরিয়তের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করতে হবে। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে তরিকত- সুফি সাধনার বিশেষ ধারা। সুফিদের মধ্যে চিশতিয়া, নকশাবন্দিয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া এরকম বহু তরিকা আছে। এই তরিকার পথে যারা হাঁটেন তাদেরকে বলা হয় সালিক- পরিব্রাজক। এই সুফি পরিব্রাজনা নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে, নানা মঞ্জিল অতিক্রম করে (সুফি পরিভাষায় মাকাম) হাকিকত - আল্লাহর দর্শনে সমাপ্তি ঘটে। এই দর্শনকে বস্তুজগতের অভিজ্ঞতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। সুফিরা তখন নিরবে আল্লাহর জিকির করেন, আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলী নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে উন্নত মানুষ হওয়ার চেষ্টা করেন। সুফি সাধনার সাথে তাই বাউল সাধনার তফাৎটা মৌলিক। বাউল সাধন পদ্ধতিতে যে যৌন বিকারগ্রস্ত মনের প্রতিচ্ছবি আমরা পাই, সুফি সাধনায় এসব কল্পনাই করা যায় না। তাই বাউল দর্শনকে কোনোক্রমেই ইসলামী সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত করা চলে না। সেই অর্থে লালনও মুসলিম সংস্কৃতির কেউ নন।

আমাদের কিছু সেকুলার বুদ্ধিজীবী আছেন যারা অনবরত বুঝাতে ব্যস্ত ইসলামের সাথে সম্পর্কহীন এদেশে যা কিছু আছে তাই অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল এবং এখানকার সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার ভিত্তি। এদের কথা শুনলে মনে হতে পারে বাউল ধর্ম একটা প্রবল জনপ্রিয় ও বিপ্লবী ধর্ম যার বন্যায় অবগাহন করে বাংলাদেশের মানুষ মুক্তির আস্বাদ পেয়েছে। আসল কথা হচ্ছে বাউল ধর্ম হিন্দু-মুসলমান উভয়ের দ্বারা বর্জিত হয়েছে। কারণ বাউল দর্শনের মধ্যে মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক-আধ্যাত্মিক মুক্তির কথা নেই, মানুষের স্বাধীনতার কথা নেই। এর মধ্যে নেই মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা মোকাবেলা করার কথা। জীবনের সাথে অসম্পৃক্ত এরকম দর্শন নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। বাউলের চিন্তাভাবনা দিয়ে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কোনো কৌশল উদ্ভাবন। মাত্র কয়েক হাজার লোকের একটি সম্প্রদায় বা তাদের কয়েকটি গান কিংবা যৌন বিকারগ্রস্ততা একটি জাতির প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান হতে পারে না।

> লালন যে ঊনিশ শতকে জন্মেছিলেন সেই সময় পূর্ববাংলার লোক-মানসে এক বড় ধরনের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এখানকার মানুষ ওহাবী ও ফরায়েজী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সামাজিক সংস্কার, অর্থনৈতিক মুক্তি ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এক গভীর লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছিল। সামাজিক শক্তি হিসেবে দেশে ইসলাম যে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের পূর্বশর্ত তৈরি করেছিল ওহাবী ও ফরায়েজী আন্দোলন তার নমুনা। এ আন্দোলনের তাৎপর্য নিয়ে আমাদের এখানে বেশি আলোচনা হয়নি। কারণ তখন বাংলার সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব দিয়েছে হিন্দুরা। এ আন্দোলন ছিল প্রকৃতিগতভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। এই অপরাধে ব্রিটিশ ও তার অনুগত হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা এ আন্দোলনকে অবমূল্যায়ন করে এবং আন্দোলনের নেতাদের চরিত্র হননে লিপ্ত হয়। ফরায়েজী আন্দোলনের অন্যতম নেতা দুদুমিয়া ব্রিটিশ ও তার দালাল জমিদার শ্রেণির অত্যাচার থেকে দরিদ্র কৃষকদের মুক্ত করার জন্য এক আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং ঘোষণা দেন-জমির মালিক জমিদার নয়, আল্লাহ। সেই জমিতে কৃষক, শ্রমিক, উৎপীড়িতের সবার অধিকার আছে। এর চেয়ে বিপ্লবী কথা আর হতে পারে না। আজ যারা লালনকে পূর্ববাংলার মানুষের সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার সাথে জুড়ে দিতে চাচ্ছেন তারা জানেন না ঊনিশ শতকে পূর্ববাংলার লোক-মানসকে সত্যিকারভাবে উজ্জীবিত করেছিল বাংলার এই ওহাবী ও ফরায়েজীদের ক্রিয়াকাণ্ড - কোনোভাবেই বাউল ধর্ম নয়। ঊনিশ শতকে আমাদের জাতিসত্তার শিকড় খুঁজতে হবে ওহাবী, ফরায়েজী ও ফকির বিদ্রোহের মধ্যে।

একটা জিনিস বোঝা দরকার যে লোক-সংস্কৃতি সব দেশে থাকে। কিন্তু সে দেশের সংস্কৃতি বলতে কেবল লোক-সংস্কৃতিকে বোঝায় না। তার চেয়ে উঁচু স্তরের সংস্কৃতিও একটা থাকে। সেই সংস্কৃতি দেশের মানুষের মননশীলতার প্রতীক। সেই সংস্কৃতি হয় ঐ দেশের জাতিসত্তা, রাষ্ট্রসত্তার ভিত্তি। আমাদের এখানকার এই ভিত্তিটা হচ্ছে ইসলাম। এটাই হচ্ছে পূর্ববাংলার মুসলিম জনমানসের

আইডেন্টিটি।

লোক-সংস্কৃতি লোকরঞ্জণের অনুপম উৎস। লালনের গান লোকরঞ্জণকারী হিসেবে বহুদিন বেঁচে থাকবে। একে আমাদের আইডেন্টিটির সাথে তুল্য করে তোলা বাহুল্য মাত্র। বিশেষ করে লালনের ধর্মের ফলিত দিকগুলোর মধ্যে যে যৌন বিকারগ্রস্ততা দৃশ্যমান তা একেবারেই অগ্রহণীয়।

বাংলাদেশের জনমানসে লোক-সংস্কৃতির যে জায়গা আছে সেটা সব সময় থাকবে। সেই জায়গায় লালনের স্থান। লোক-সংস্কৃতিকে ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বি হিসেবে খাড়া করার চেষ্টা পণ্ডশ্রম, যা আমাদের সেকুলারবাদীদের আরাধ্য। লোক-সংস্কৃতির জায়গায় লোক-সংস্কৃতি থাকবে, ইসলামের জায়গায় ইসলাম।

আজ আমাদের সেকুলারবাদী বুদ্ধিজীবীরা লালনকে নিয়ে হৈচৈ করছেন। কারণ তারা চান আমাদের জাতিসত্তা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে। তারা চান লালনকে দিয়ে পূর্ববাংলার মুসলিম জনমানসে বিপন্নতা তৈরি করতে। এরকম চেষ্টা অতীতেও হয়েছে এবং আমাদের জাতীয়তাবাদ ও সংস্কৃতি নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির মতো বহু ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ইসলামের স্বাতন্ত্র্য চেতনা সেইসব বিপন্নতাকে বার বার জয় করেছে। আমাদের বিবেচনায় থাকতে হবে বাংলাদেশের মুসলমানদের কারণেই বাংলাদেশের উদ্ভব হয়েছে। তাই পূর্ববাংলার মানুষের জাতিসত্তা ইসলামের ধারার বাইরে খুঁজতে যাওয়া বৃথা।

সূত্রঃ বুকমাস্টার প্রকাশিত □বাংলাদেশ জিন্দাবাদ□ গ্রন্থ

ফাহমিদ-উর-রহমান

ফাহমিদ-উর-রহমান একজন মননশীল প্রাবন্ধিক ও বুদ্ধিজীবী। পেশায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হলেও ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি লিখছেন। সমাজ ও সংস্কৃতি সচেতন বিধায় তিনি আধুনিকতার সমস্যা নিয়ে লিখেছেন। আধুনিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ নিয়েও তিনি কথা বলেছেন। তার ঋদ্ধ লেখালেখি নতুন আঙ্গিকে বাঙালি মুসলমানের জাতিসত্তার উপরে আলোকপাত করেছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নামঃ ১। ইকবাল মননে অন্বেষণে (১৯৯৫) ২। অন্য আলোয় দেখা (২০০২) ৩। উত্তর আধুনিকতা (২০০৬) ৪। সেকুলারিজমের সত্য মিথ্যা (২০০৮) ৫। উত্তর আধুনিক মুসলিম মন (২০১০) ৬। সাম্রাজ্যবাদ (২০১২) ৭। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ (২০১৩) ৮। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও বাংলাদেশ (২০১৪) পাশাপাশি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ১। জামাল উদ্দীন আফগানী: নব প্রভাতের সূর্য পুরুষ (২০০৩) ২। মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭ (২০০৯) ৩। ফরায়েজী আন্দোলন : আত্মসত্তার রাজনীতি (২০১১)